SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায় নীতি ও আদর্শ: একটি দার্শনিক অন্বেষণ

ড. অতসী মহাপাত্র

ভূমিকা:

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৮-১৯৪৮) হলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শনে একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। শুধুমাত্র দর্শন চর্চায় নয়, ইতিহাস ও বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সক্রিয়। তাই জননেতা হিসাবেও তাঁর অবদান ও কর্তৃত্ব ছিল অসাধারণ। তবে কোন একটি বিশেষ দর্শনভাবনা বা রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর চিন্তার জগৎকে আলোড়িত করেছিল সমসাময়িক ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য ও জীবনচর্চা। খুব অল্পবয়স থেকেই তিনি সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি নিজের কাছেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে কখনো সত্যের পথ থেকে চ্যুত না হয়ে, হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে কেবলমাত্র অহিংসার পথ অবলম্বন করে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করবেন। এগুলির উপর ভিত্তি করে জীবনকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন এক অনন্য জীবনদর্শন। জীবন সম্পর্কে তিনি গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য ও অহিংসার পূজারী। তাঁর সমগ্রজীবন মিলিত হয়েছিল স্বদেশ ও বিদেশের সামাজিক নৈতিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির যথাযথ অনুশীলনে, পদ্ধতি নির্ধারণে এবং সত্যদর্শনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অকৃত্রিম প্রচেষ্টার মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী"। তিনি তাঁর জীবনের চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ভারতবাসীকে তাঁর বাণী প্রদান করেছিলেন, সেজন্য কেবলমাত্র গান্ধীর জীবনের আলোচনার মাধ্যমেই তাঁর বাণীসমূহের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর (রায়, ১৯৮৭, পৃ ১০)। এই অর্থে তাঁর জীবন, কর্ম এবং ব্যক্তিত্ব সবকিছুই তাঁর জীবনাদর্শের অন্তর্গত। কাজেই গান্ধীর সমগ্র জীবনদর্শনের মূলকথা হল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শনভাবনা তথা নৈতিক আদর্শের উপর জীবনকে স্থাপন করা। আলোচ্য প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ ও নৈতিক ভাবনার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গান্ধীবাদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা:

গান্ধীজী মনে প্রাণে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও সভ্যতার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। সেজন্য গান্ধীভাবনার মূলসূত্র নিহিত রয়েছে দার্শনিক আদর্শবাদে। নীতিবোধ ও মূল্যবোধকেই তিনি মানুষের ব্যক্তিজীবনের তথা সমাজজীবনের ভিত্তিস্বরূপ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সততা। সত্যবাদিতা, সত্যের পরীক্ষা করতে করতে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। অহিংসাকে হাতিয়ার করে অপরাধীর পরিবর্তে অপরাধকে প্রতিহত করা, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করা, সত্যনিষ্ঠা ও আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হওয়ার শিক্ষা হল তাঁর নতুন রাজনৈতিক ভাবনা তথা গান্ধীবাদের ভিত্তিস্বরূপ (মহাশ্বেতা দেবী, ১৯৯৪, পৃ- ৪-৫)। তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তায় সমাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, মানবিকবিদ্যা, রাজনৈতিক দর্শন সবকিছুকে পৃথক প্রক্রিয়া বলে

চিহ্নিত না করে এগুলিকে একত্রিত করে তিনি মানবজীবনকে সামগ্রিক রূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। অধিবিদ্যক, নৈতিক, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত পদ্ধতিকেই গান্ধীজী সত্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এই প্রকার পদ্ধতি হল সংমিশ্রিত পদ্ধতি (Synthesis Outlook)। গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব ঘটনাবলী ও প্রভাব কার্যকরী হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল পারিবারিক প্রেক্ষাপট। তাঁর পরিবার প্রচলিত বৈষ্ণবধারার অনুগামী হলেও বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি গান্ধী পরিবারের আসক্তি ছিল না (Parek, 1997, p-01)।[৩] তবে তাঁর পিতার সততা, কর্তব্যবোধ, ও মাতার ধর্মবোধ তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। উদার মানসিকতার অধিকারী গান্ধীর মধ্যে অন্য ধর্মের প্রতি বিরাগ ছিল না। ধর্ম নয়, সত্য ও নৈতিকতাকেই তিনি সন্ধান করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নীতিই হল সবকিছুর মূল এবং সকল নীতির সারকথা হল সত্য। নৈতিকতার আলোচনায় তিনি সর্বপ্রথম বেদ, ভগবদগীতা, বাইবেল এবং কোরানের বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা ভগবদগীতা থেকে লাভ করেন। তাঁর চিন্তায় অহিংসার ধারণার ক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, টলস্টয়, রাস্কিন, থোরো, ম্যাৎসিনি প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের লেখা থেকেও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন প্রবলভাবে অতীতের অনুবর্তী এবং পুনরুত্থানবাদী (revivalist) তেমনি অন্যদিকে তিনি আবার পরিবর্তনকামী। সেজন্য তাঁকে 'ঐতিহ্য নির্ভর আধুনিকতাবাদী' ('tradition bound moderniser') নামে অভিহিত করা চলে। কোন সুনির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক তত্ত্বদর্শন তিনি গড়ে তোলেন নি। তিনি দাবি করেন গান্ধীবাদ বলে কোন কিছু নাই। তিনি নিজেকে ব্যবহারিক ভাববাদী (Practcal Idealist) বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জগৎ ছিল কর্মের জগৎ। তিনি ভাববাদীদের মতো ব্যবহারিক জগৎ কিংবা দৈনন্দিন জীবনকে অস্বীকার করেন নি। তিনি যে সত্যকে অন্বেষণ করেছিলেন তা দার্শনিকের অমূর্ত সত্য নয়। তাঁর মতে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষকে সত্য উপলব্ধি করে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর সমগ্র চিন্তা ও কর্ম ধর্মীয় চিন্তা ও মানবতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে (মহাপাত্র ও বন্দোপাধ্যায়, ২০১৬, পৃ ২৩৮)। অহিংসা ও প্রেমের পথে মানুষে মানুষে ঐক্যবোধে উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবন নয়, গোষ্ঠীর জীবন, জাতির জীবন এমনকি বিশ্বমানবের জীবনেও এই আদর্শকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন (সেনগুপ্ত, ২০০২, পৃ- ০৩)।

পঞ্চবিধ নৈতিক সৎগুণ ও গান্ধীভাবনা:

গান্ধীজী সত্যাগ্রহকে সর্বোচ্চ নৈতিকতা রূপে স্বীকৃতি দিলেও জীবনের অন্য সদগুণগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা পবিত্র ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ- ১২১)। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে পাঁচটি প্রধান নৈতিক সৎগুণের (moral virtues) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এগুলি পঞ্চশীল বা পঞ্চ মহাব্রত নামেও অভিহিত করা হয়। এই সৎগুণগুলি হল অহিংসা (Non violence), সত্য (Truthfullness), অস্তেয় (Non- Staling), ব্রহ্মচর্য (Chasity) ও অপরিগ্রহ (Non-possession)। গান্ধীজীও এই গুণগুলি সমর্থন করেন এবং এর সঙ্গে আরও দুটি গুণ যোগ করার সুপারিশ করেছেন যথা অভয় ও ঈশ্বরে বিশ্বাস। তবে এগুলির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল এই যে, গান্ধী উক্ত গুণগুলিকে নিজের মতো করে এবং নিজের

অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সৎগুণগুলিকে সমকালীন প্রয়োজনে ও তৎকালীন অস্তিত্বের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে এই গুণগুলি শুধু বাহ্যিকভাবে অনুশীলন করলে চলবে না, তা করতে হবে চিন্তা, বাক্য ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে।

অহিংসা: গান্ধীর মতে এগুলির মধ্যে অহিংসা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৎগুণ। গান্ধী বলেন "জগতকে শিক্ষা দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই। 'সত্য' ও 'অহিংসা' হল পাহাড় পর্বতের মতোই প্রাচীন ধারণা। সমস্ত কিছু যা আমি করেছি তা হল যতটা সম্ভব বৃহৎ পরিধির মধ্য থেকে এই উভয়ের উপর পরীক্ষা করা। এরূপ পরীক্ষা করার সময় আমি মাঝে মাঝে ভুল করেছি এবং সেই ভুলের মাধ্যমে শিখেছি। আমি জীবন ও এর সমস্যার ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসা নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। বস্তুতঃ সত্যলাভের চেষ্টার মাধ্যমে অহিংসাকে আবিষ্কার করেছি। (Bose, 1960, p-13) অহিংসা হল উপায়, সত্য হল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। উপায়কে উপায় হিসেবে গণ্য করতে গেলে অবশ্যই সেটিকে আমাদের সামর্থ্যের গন্ডীর মধ্যে রাখতে হবে এবং তাই অহিংসা হল আমাদের সর্বোত্তম কর্তব্য। যদি আমরা উপায় সম্পর্কে সতর্ক হই, তবে আমরা দ্রুত কিংবা বিলম্বে হলেও লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাতে পারব। গান্ধিজির মতে, অহিংসার সদর্থক ও নঞর্থক দুই প্রকার অর্থ আছে। তাঁর মতে এর সদর্থক দিকটি বেশি মৌলিক, কারণ এটি নঞর্থক দিককেও বোঝায়, আবার এর মূল স্বরূপকেও প্রকাশ করে। অহিংসার প্রচলিত অর্থ হল হিংসা না করা, আঘাত না করা। যেকোন ক্ষেত্রে অহিংসা বলতে হিংসার বিপরীতকে বোঝায়। বস্তুতপক্ষে অহিংসা ধারণাতে গান্ধীজী সম্ভবতঃ জৈনধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জৈন ধর্মে চিন্তা, বাক্য ও কর্মের মাধ্যমে অহিংসার অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে।

তবে গান্ধীর অহিংসার দিকগুলি জৈনধর্মের মতো এত কঠোর নয়। কারণ তিনি জানতেন যে জৈনধর্মের মতো এত কঠোরভাবে অহিংসা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। তিনি এও জানেন যে, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হিংসার আশ্রয়গ্রহণ অপরিহার্য্য, যেমন খাদ্যগ্রহণ, পানীয় গ্রহণ, পদব্রজে ভ্রমণ, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি। অন্ততপক্ষে কিছু হলেও অন্য দেহকে আঘাত না করে একজন ব্যক্তি বা প্রাণীর দেহ স্থিতিশীল রাখা সম্ভব নয়। তবে গান্ধীজী মনে করেন হত্যা করা বা আঘাত করাকে হিংসা বলা যায় কয়েকটি বিশেষ শর্তে। এই শর্তগুলি হল অহংকার, ঘৃণা, স্বার্থ, মন্দ অভিপ্রায় এবং অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্য। এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে জীবের প্রতি যেকোন প্রকার আঘাত করাকে হিংসা বলা হয়। এভাবে অহিংসার নঞর্থক অর্থ হল 'হত্যা না করা' অথবা 'আঘাত না করা'। গান্ধিজির মতে, সদর্থক দিক থেকে অহিংসা প্রেম ছাড়া কিছু নয়। (Lal, 1973, p-110-111) প্রেম হল এক প্রকার একত্ববোধ। অহিংসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হত্যা, ঘৃণা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, প্রতিশোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি থেকে মনকে মুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস। কারণ এগুলি প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি করে। প্রেমের ক্ষেত্রে নিহিত থাকে কতকগুলি আদর্শভাব যেমন পরোপকার, করুণা, ক্ষমতা, ভদ্রতা, সহানুভূতি ইত্যাদি। প্রেম বা অনুরাগ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে খুব কঠিন ব্যাপার। হিংসা করা সহজ কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে চরম শক্তি প্রয়োজন। এই ব্যাপারটি আরও শক্ত হয় যখন সাধারণভাবে যাকে বিরোধী বা শত্রু বলে মনে হয় তাকে ভালোবাসার প্রয়োজন হয়। তাই গান্ধী বিশ্বাস করেন যে অহিংসা সবলের জন্য নির্দিষ্ট, দুর্বলের জন্য নয়। হিংসা হল দুর্বলতারই সংকেত। যিনি ভয়কে জয়

করতে পেরেছেন শুধুমাত্র তিনিই সত্যিকারের অহিংস হতে পারেন। হত্যা করার ক্ষমতা শক্তির চিহ্ন নয়। লক্ষ্য (সত্য) অর্জনের পথে মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতাই হল প্রকৃত শক্তি।

কিন্তু অহিংসা শুধুমাত্র জীবের প্রতি আঘাত করা থেকে বিরত থাকা নয়। এর দ্বারা সদর্থক অর্থে অন্য জীবিত প্রাণীর প্রতি সদর্থক মনোভাবকে বোঝায়। গান্ধীজীর মতে অহিংসা মানুষের একটি স্বাভাবিক গুণ। বিবর্তনের গতি অহিংসার দিকেই ধাবিত হয়। তাই অহিংসা হল কারও প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছার উপর সচেতন ও সুচিন্তিত সংযম। প্রকৃত সবল ব্যক্তি পাশবিক শক্তির দ্বারা জয়ী হন না, ভয়শূন্য প্রেমের দ্বারা তিনি জয়ী হন। একজন প্রকৃত অহিংস অনুশীলনকারী ব্যক্তি একজন অত্যাচারী সম্রাটের শক্তিকেও পরাস্ত বা অগ্রাহ্য করতে পারে। অহিংসা হল কর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ। অহিংসা কোনভাবেই নিস্ক্রিয় মনোভাব নয়। অহিংসার বীজ হৃদয়ে থাকে; এবং কর্মের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। তাঁর বিশ্বাস ছিল অহিংসার অনুশীলন সার্বিকভাবে বা বিশ্বজনীনভাবে করা যেতে পারে। এটা এমন এক শক্তি যা সমানভাবে সকল স্থানের এবং কালের শিশু, যুবক, পুরুষ, মহিলা ও বয়স্ক ব্যক্তি অর্থাৎ সকলে প্রয়োগ করতে পারে। অহিংসা নীতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান শর্ত আছে। যদি কারও ঈশ্বরের প্রতি প্রাণবন্ত ও অটল বিশ্বাস না থাকে তবে অহিংসার অনুশীলন করা যায় না। অন্য কারণগুলির মধ্যে গান্ধী তাঁর অহিংসাকে অগ্রাধিকার দেন কারণ যদি সকল জীবকে বাঁচার অধিকার না দেওয়া হয় তবে কোন গুণের অনুশীলন সম্ভব হয় না। অন্য সকল গুণের ক্ষেত্রে প্রেম পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে থাকে। সকল সদ্গুণের ক্ষেত্রে কিছু আত্মত্যাগ প্রয়োজন এবং প্রেম ব্যতীত এই আত্মত্যাগ সম্ভব নয়।

সত্য: গান্ধীভাবনায় সত্যকেই ঈশ্বর বলে গণ্য করা হয়। তাই তিনি বলেন সত্যের প্রতি নিষ্ঠা হল একটি সত্যগুণ (Virtue)। এই প্রসঙ্গে Iyer বলেছেন "From first to last, satya, or truth, was sacred to Gandhi – the supreme value in ethics, politics and religion, the ultimate source of authority." (Iyer, 1973, p-150) গান্ধীজী কিছুটা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের মতো স্বীকার করেন যে, সত্য হল স্বতঃপ্রকাশ (Self revealing)। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা, অবিদ্যা এবং মিথ্যাজ্ঞানের ফলে আমরা অন্ধ। অজ্ঞতা বা মিথ্যাজ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক বা আবশ্যিকগুণ নয়। তিনি বলেন যে একপ্রকার নৈতিক অবনতি আমাদের মধ্যে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান সৃষ্টি করে। তিনি স্পষ্টভাবে ছয়টি ভয়ঙ্কর শত্রু কথা বলেছেন, যেগুলি ব্যক্তিমনে কুসংস্কার, বিদ্বেষ ও মন্দ চিন্তা উৎপন্ন করে। এবং এজন্যই কোন ব্যক্তি সত্যকে অনুভব করতে অসমর্থ হয়। এই শত্রুগুলি হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এবং মিথ্যাত্ব। তাই সত্যের অনুশীলনের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়াস চালাতে হবে। এই শত্রুগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই নৈতিক পবিত্রতা ও সাহসের অনুশীলন বা চর্চা করতে হবে; এবং এই শত্রুগুলি যাতে তার দৃষ্টিকে মেঘাচ্ছন্ন করে না তোলে সেজন্য ব্যক্তিকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন যে, সত্যতার অনুশীলন করতে হবে এবং এটি এমন একটি শিল্প যার বিকাশ সাধন সম্ভব হয় অবিরাম শৃঙ্খলা ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

অস্তেয়: 'অস্তেয়' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। প্রথম অর্থে 'অস্তেয়' বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যদি কোন কিছু প্রদান না করে তবে তাকে না বলে তার সম্পত্তি গ্রহণ না করা বা চুরি না করা। দ্বিতীয় অর্থে এই

নীতি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ বা অধিকার করতে নিষেধ করে। গান্ধীজী উভয় অর্থে 'অস্তেয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, চুরি করা হল এক ধরনের হিংসা। সম্পত্তি বাহ্যিক জীবনের অংশ কারণ দৈহিক অস্তিত্ব সম্পত্তির উপর নির্ভর করে। তাই কারও সম্পত্তি চুরি করার অর্থ হল তার বাহ্যিক জীবনকে অধিকার করা। সেজন্য অচৌর্যের অনুশীলন করা উচিত।

অপরিগ্রহ: গান্ধীর মতে অপরিগ্রহের অর্থ হল সন্তোষ অর্থাৎ জীবনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আরও পাওয়ার জন্য লালায়িত না হওয়া। কারও পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটাই এই অপরিগ্রহের অনুশীলন করতে হবে। এই আদর্শ থেকেই তিনি তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনাকে নিঃসৃত করেন, যা 'অছিবাদ' নামে খ্যাত। মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদী ধারণা সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের এই অপরিগ্রহের ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

ব্রহ্মচর্য: 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'ব্রহ্মে অবস্থান' বা বিচরণ। এর প্রচলিত অর্থ হল যৌন সম্পর্কের প্রতি বা জননেন্দ্রিয়ের প্রতি দৈহিক সংযম। গান্ধী এই শব্দটিকে উভয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'ব্রহ্মচর্যে'র আরেকটি অর্থ হল সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের উপর সংযম ও প্রতিরোধ (Lal, 1973, p-137)। তাঁর মতে এজন্য আমাদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন এবং এমন খাদ্যগ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে স্বাস্থ্য নষ্ট না হয় ও প্রণয়োদ্দীপক ও অনিচ্ছাকৃত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি না হয়।

অভয়: গান্ধীভাবনায় অহিংসার অনুশীলনে অভয়কে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত বলে গণ্য করা হয়। এটি একটি কঠিন অনুশাসন কারণ এতে শুধু সাধারণ ভয়কে জয় করলেই হয় না, এর দ্বারা অনশন, অপমান, দৈহিক আঘাত, এমনকি মৃত্যুভয় থেকেও মুক্তি বোঝায় (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ-১২৪)। গান্ধীর মতে কাপুরুষ কখনোই নির্ভীক হতে পারে না। তাই অভয় হল এমন একটি সদ্গুণ, যা হল প্রতিকূলতা ও বিপদের সম্মুখীন হতে সমর্থ নৈতিক সাহস।

ঈশ্বরে বিশ্বাস: গান্ধীজীর জীবনসত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল ঈশ্বরে বিশ্বাস। তাঁর জীবনের সকল কর্ম, চিন্তা এবং প্রয়োগকে একটি পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ করেছে এই তত্ত্ব, যা ঈশ্বরে বিশ্বাস নামে পরিচিত। তাঁর কাছে ঈশ্বর হলেন সত্য (God is Truth), যদিও পরবর্তীকালে তিনি সত্যকেই ঈশ্বর (Truth is God) বলে অভিহিত করেছেন (দাশগুপ্ত, ১৯৯৯, পৃ- ০১)। ঈশ্বর হলেন সর্বত্র বিরাজমান। সকল প্রকার অমঙ্গলের মূলে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না করা। তাঁর কাছে সত্য এবং ঈশ্বর এক হওয়ায় তিনি সমগ্র জীবন ধরেই সত্য নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস সকল মানুষ এবং সকল প্রকার সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের স্পর্শ বিদ্যমান। পরমকল্যাণের প্রতি যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে উপরোক্ত সৎগুণগুলির কোনটিও অনুশীলন করা যাবে না। সুতরাং এই বিশ্বাস নৈতিকতার একটি পূর্বস্বীকৃতি। তিনি সত্যাগ্রহীর জীবনে এই ব্রত বা সৎগুণটিকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যকর্ম বলে অভিহিত করেছেন।

সত্যাগ্রহের ভাবনা ও নৈতিকতা:

এই নৈতিক সৎগুণগুলির মধ্যে অন্যতম হল সত্য ও অহিংসা। সত্যের মধ্যে অহিংসা আছে এবং অহিংসার মধ্যে সত্য আছে। গান্ধীজীর কাছে সত্য হল ভগবান। অহিংসাই সত্য এবং সত্যই অহিংসা। অহিংসা পরমধর্ম, অসীম ভালোবাসা। গান্ধীর মতানুসারে সত্য ও অহিংসা ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত। গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ধারণা হল এমন এক নীতিনিষ্ঠ জীবন পদ্ধতির ধারণা বা আদর্শ, যা সামাজিক ক্রিয়াকে সার্থক ও মূল্যবান করে তোলে। তাঁর মতে সৎ ও মহৎ জীবনযাপন করতে হলে অহিংসা নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন উভয় ক্ষেত্রেই আত্মবিকাশ সাধনের জন্য তিনি এই নীতি প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। সত্যাগ্রহ হল একটি সুসংহত জীবনদর্শন। এর যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা মানুষ সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলার সামর্থ্য রাখে। এই প্রতিরোধ বাহ্যিক শক্তির পরিবর্তে আত্মিক শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হবে। একজন সত্যাগ্রহী আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রেমের দৃষ্টিতে অন্যায়কারীর হৃদয় পরিবর্তন করবে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২৩, পৃ- ৭২)। সত্যাগ্রহীকে অহিংসার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধির জন্য নিরন্তর অক্লান্তভাবে উদ্যোগী হতে হবে। একমাত্র অহিংস পথে সত্যানুসন্ধান ও সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। আক্ষরিক অর্থে সত্যাগ্রহ বলতে বোঝায় সত্যের প্রতি আগ্রহ বা আনুগত্য। এটি হল সত্যের শক্তি বা আত্মিক শক্তির জাগরণ। গান্ধীজী ব্যাখ্যাত সত্যাগ্রহের মূলনীতি হল তিনটি অহিংসা, সত্য এবং তপস্যা বা নিজের প্রতি নিগ্রহবরণ। টলস্টয়ের অহিংসা ও প্রেমের বাণী, গীতার নিষ্কাম কর্ম, খ্রীষ্টের সত্য ও মানবতার আদর্শ, মহম্মদের সহজ সরল জীবনদর্শন প্রভৃতি গান্ধীজিকে সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল (মহাপাত্র ও বন্দোপাধ্যায়, ২০১৬, পৃ ২৪৭) তাছাড়া সত্যাগ্রহের একটি অন্যতম দিক হল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, কেননা ঈশ্বরের প্রতি অটল ও প্রাণবন্ত বিশ্বাস না থাকলে সত্যাগ্রহের অনুশীলন করা যায় না। আত্মার শক্তির উৎস হল ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ধর্মে যথার্থ ভক্তি। তাই সত্যাগ্রহের ভাবনার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের একটি ইচ্ছা। সত্যাগ্রহে আছে সংযম, ধৈর্য, আত্মিক শক্তি, প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, মহত্ব। আত্মার মুক্তির জন্য শপথ, সংকল্পে অটল, দুঃখ-যাতনা, অসীম ধৈর্য, সৌজন্যবোধ সত্যাগ্রহের শক্তিতে অর্জিত থাকে, এগুলি সত্যাগ্রহের বিজয়কে সূচিত করে (Verma, 1994, p-160). গান্ধীর দর্শনে অহিংসা নীতির মতো সত্যাগ্রহ ব্যাপকভাবে অর্থবহ। সত্যাগ্রহ হল সত্যের জন্য নৈতিক চাপ সৃষ্টি তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। তাঁর মতে অহিংস পথে সত্যের উপলব্ধির জন্য সত্যাগ্রহীকে সতত সক্রিয় থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, সত্যাগ্রহীকে সত্যের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। এককথায় সত্যাগ্রহ হল সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস জীবন সংগ্রাম। তাই সত্যাগ্রহী দৃঢ় মনোবল নিয়ে নৈতিকভাবে সামিল হবে। সে শুদ্ধমনের নির্দেশে পরিচালিত হবে, সে আঘাত সহ্য করবে, প্রত্যাঘাত করবে না। এককথায় সত্যাগ্রহী হবে আত্মসংযমী, সত্যনিষ্ঠ, অহিংসা ও ক্ষমার মূর্ত প্রতীক।

উদ্দেশ্য ও উপায়ের দর্শন ও নৈতিকতা:

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর দর্শনে লক্ষ্য ও পন্থা তথা উদ্দেশ্য ও উপায়ের সম্বন্ধের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই উপায়ের যাথার্থ্যতা নির্ধারিত হয় (ends jutifies the means)- মেকিয়াভেলী এবং কার্লমার্কস প্রমুখদের এরূপ ধারণার বিরোধিতা করে গান্ধীজী দাবি করেন উপায়ের উপরেই উদ্দেশ্যের গুণাগুণ নির্ভরশীল।

উপায়টি যেমন হবে, উদ্দেশ্যটি তেমন হবে। তাঁর কাছে উপায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক, কেননা উপায়ের উপর নির্ভর করেই উদ্দেশ্যের যথার্থ্যতা নির্ধারিত হয়। তাঁর মতে উপায়কে যদি যথাযথভাবে পরিচালিত করা যায়, তাহলে উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব। এই উপায়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গান্ধীজী তাঁর নীতিদর্শনে উপযোগবাদের তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। তবে মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ও উপায়ের দর্শনের সঙ্গে সত্য ও অহিংসার একটা প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অহিংসা হল উপায় এবং সত্য হল লক্ষ্য। সত্য হল জীবনের পরমাদর্শ, এটিই হল পরমলক্ষ্য, যার প্রতি আমাদের প্রতিনিয়ত অনুগমন করা উচিত। এই সত্যই হল পরমার্থস্বরূপ। সত্যলাভের পথ হল অহিংসা। একমাত্র অহিংস উপায় ছাড়া সত্যকে লাভ করা যায় না। উভয়ই একই মুদ্রার দুটি দিক মাত্র। এটি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আমরা সত্যকে লাভ করতে পারব না। উদ্দেশ্য হল লক্ষ্য, উপায় হল সেই উদ্দেশ্য উপলব্ধির ক্ষেত্র। 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে গান্ধীজী উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সম্বন্ধকে ব্যাখা করতে গিয়ে বলেন যে, এই সম্বন্ধ হল বীজের সঙ্গে চারাগাছের মতো। উপায় যুক্ত বীজের সঙ্গে এবং উদ্দেশ্য যুক্ত চারাগাছের সঙ্গে। বীজের সঙ্গে চারাগাছের যেমন ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি উপায়ের সঙ্গে উদ্দেশ্য অনুরূপ সম্বন্ধে রয়েছে। এদের কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। গান্ধীজী উপায়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে উপায় হল সবকিছু। বস্তুতঃপক্ষে সৃষ্টিকর্তার আমাদের উপর সীমিত পরিমাণে অধিকার দিয়েছেন, লক্ষ্যের উপর নয়। তবে উপায়টি সঠিক হলে উদ্দেশ্যটিও ভালো বা কল্যাণজনক বলে বিবেচিত হবে। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজির জীবনদর্শনে উপায় এবং লক্ষ্য হল দুটি পরিবর্তন যোগ্য পদ। তিনি লক্ষ্য হিসাবে সত্যকে সামনে রেখে উপায় হিসাবে অহিংসাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১১, পৃ- ৭২) তিনি নৈতিকতা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন সত্য ও অহিংসার মাধ্যমে। তিনি বলেন স্বরাজ হল ভারতীয় নাগরিকদের লক্ষ্য; এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি অহিংসা নীতির উপর জোর দেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি যে সব নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা হল অহিংসা, সত্য, সামাজিক সাম্য, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, পুঁজিবাদ এমনকি যেকোনো ধরণের শোষণের বিরোধিতা এবং তিনি যেসব উপায় বা পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তা হল সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ধর্ণা, ধর্মঘট, প্রতীকী বা আমরণ অনশন, হরতাল প্রভৃতি। তবে গান্ধীভাবনায় স্বরাজ বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা রাজনৈতিক লক্ষ্য হলেও সত্য বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের লক্ষ্য এবং অহিংসাই হল সেই লক্ষ্যসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। (বন্দোপাধ্যায়, ২০২৩, পৃ- ৯২)

রামরাজ্য ও নৈতিক ভাবনা:

একথা স্মরণীয় যে, গান্ধীজীর সমাজভাবনা এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি ছিল তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধ। তিনি জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও হিন্দুত্বের বা হিন্দুধর্মের কোন সংকীর্ণতা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, বরং তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল নৈতিকতার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন সত্যের সন্ধানে, যেখানে মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের লক্ষ্যের মধ্যে অভিন্নতা বিদ্যমান। তাঁর মতে সব ধর্মই নিজস্ব বিশ্বাস এবং প্রকরণ অনুযায়ী সার্বভৌম সত্যের সন্ধানে ব্রতী। কিন্তু গান্ধীজী মানুষের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চেতনা

এবং বস্তুগত জীবনের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানার পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যক্তিমানুষের বিকাশ, সামাজিক ও বৈষয়িক অগ্রগতি এবং মানুষের ধর্মচেতনাকে তিনি একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন। তবে তিনি ঐতিহ্য বজায় রেখে স্বাধীন ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই রামরাজ্য বলতে তিনি 'Sovereignty of people based on pure moral authority' বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে জনগণ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। তাঁদের কাজকর্ম আচার-আচরণের ভিত্তি হবে নৈতিকতা। রাম ছিলেন ন্যায়বিচার, সহিষ্ণুতা ও নির্লোভতার প্রতীক। তিনি তাঁর রাজ্যে যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ন্যায়বিচার পাবে; জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সহিষ্ণুতার ও অহিংসার অনুশীলন করবে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিংসা, লোভ প্রভৃতি ষড়রিপু থেকে মুক্ত হবে। গান্ধীর মতে, রামরাজ্য হবে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র, যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না। এই রামরাজ্য হবে ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক। স্বাধীন ভারতে সেই আদর্শ পরিমণ্ডল গড়ে তোলাই ছিল গান্ধীভাবনার মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য তিনি কোন ধর্মকে বিশেষভাবে গুরুত্ব না দিয়ে সকল ধর্মকেই সমদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতেন। তাই K. S. Padhy বলেছেন, "He (Gandhi) believed that people in Ramraj should lead a happy life, without any hangovers and discrimination on the basis of caste, race, religion, sex etc" (Padhy, 2011, p-182). রামরাজ্য হল 'Kingdom of God on Earth'। এই ঈশ্বর কোন বিশেষ ধর্মের প্রতীক নয়, এটি হল সবধর্মের প্রতীক, যার মূল ভিত্তি হল সত্য এবং অহিংসা। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন ধর্ম কেবল স্বার্থপর আত্মশুদ্ধি নয়, তা সমাজ বা সর্বজনীন শুদ্ধির এক শক্তিশালী আয়ুধ। তাঁর মতে, পঞ্চায়েতি রাজ বা রামরাজ্য ধর্মের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে। ধর্মাবোধেই রামরাজ্যের অভ্যুদয় এবং ধর্মের নৈতিক অনুসরণেই রামরাজ্যের বাস্তব প্রতিষ্ঠা সম্ভব (ভট্টাচার্য, ২০১১, পৃ-২৫)।

ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক:

তাই গান্ধীভাবনায় ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত প্রকট। তাঁর মতে ধর্ম ও নৈতিকতা একে অপরকে আচ্ছাদিত করে রাখে। ধর্ম বলতে তিনি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি নৈতিক আচার আচরণ বা জীবনযাত্রা প্রণালী বুঝিয়েছেন। তাঁর কাছে ধর্ম ও নৈতিকতা হল অভিন্ন। নৈতিক ভিত্তি ছাড়া ধর্ম অর্থহীন। সমাজের নিঃস্বার্থ সেবাকেই তিনি ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের অন্তর্গত বলে মনে করেছেন (সেনগুপ্ত, ২০০২, পৃ-৫০)। সেজন্য প্রকৃত ধর্মকে প্রকৃত নৈতিকতা থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তিনি দ্বিধাহীনভাবে যেকোন ধর্মমতকে বাতিল করে দিতে পারতেন যদি তাঁর সঙ্গে নৈতিকতার বিরোধ দেখা দেয়। আবার, তিনি যেকোন রকম অযৌক্তিক ধর্মীয় উক্তিকেও স্বীকার করতে রাজী ছিলেন যদি তা অনৈতিক না হত (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১১, পৃ-৭২)। তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে অন্তর্নিহিত শুভচেতনা এবং ঐশীশক্তির স্ফুরণ (sparks of divinity)। মানুষের অন্তর্নিহিত এই সৎপ্রবৃত্তির আবিষ্কার এবং ধারাবাহিক অনুশীলন ও তার বিকাশের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে। গান্ধীর মতে প্রার্থনা, আত্মশাসন, অহিংস সত্যাগ্রহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃত সত্তার বিকাশ ঘটে এবং মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের সঠিক পথনির্দেশ পেতে পারে। উচ্চস্তরের নৈতিকতা, ত্যাগের আদর্শের অনুশীলন, উদারতা,

ভালোবাসা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সম্পীতির বাতাবরণ তৈরি করা যেতে পারে বলে গান্ধীজী মনে করেন। গান্ধীর মতে জীবনের সবরকম অবস্থার মধ্যেই 'সত্যাগ্রহ' হল একটি কার্যকরী শক্তি এবং তা প্রতিটি মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠকর্তব্য। এটি মানুষের আত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করে, শুভকর্ম সম্পাদনের পথে মানুষকে প্রেরণা যোগায়। সেই কারণে তিনি কখনোই রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করলে রাজনীতি হীনমূল্য হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বাস করেন নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা থেকেও রাজনীতিকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাঁর ধর্মচিন্তায় সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না। তাঁর মতে ধর্ম সব মানুষকে মিলিত করে, বিচ্ছিন্ন করে না। এইভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যেকোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি নৈতিকতাভিত্তিক সমাধান প্রদানের চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে V.P.Varma বলেছেন, "He was content with giving vent to immediate morally oriented suggestions for the solution of the contemporary social, economic and political problems" (Varma, 1994, p- 02).

অছিবাদ, সর্বোদয় ও নৈতিকতা:

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অছিবাদ এবং সর্বোদয়ের তত্ত্ব তাঁর অর্থনীতি এবং সমাজভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও তা নৈতিক প্রত্যয়গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশোপনিষদের ত্যাগের আদর্শের দ্বারা প্রাণিত হয়ে গান্ধিজীর অছিবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর মতে ত্যাগ এবং বৈরাগ্য হল হিন্দুধর্মের সারকথা। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যাক্তেন ভুংজিতা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ " (ঈশ ১)

অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যপ্ত। জগতের সবকিছুই ভগবানের। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ত্যাগের মাধ্যমে পার্থিব বিষয়বস্তু ভোগ করা উচিত। প্রকৃত প্রেমের মহিমা ত্যাগে, ভোগে নয়। প্রকৃত অর্থে ধনসম্পত্তি কারও ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এরূপ ধারণার উপর ভিত্তি করে গান্ধিজি বলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্পত্তির নিছক ট্রাস্টি হিসাবে বিবেচিত হবে এবং নিজেকে এই সম্পত্তির রক্ষাকর্তা বলে মনে করবে। মানুষ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁর সহজ সরল জীবনযাপনের জন্য যৎসামান্য ব্যয় করে বেশীরভাগ অংশ সমাজের জন্য ত্যাগ করবে। "Fundamental to the Gandhian theory of trusteeship is the idea that freedom and equality are values which can be realised only through a moral effort on the part of the individuals and groups rather than the creator of external conditions (Bandopadhya, 1969, p-139). তাই অছিবাদ তাঁর কাছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কৌশল নয়, অছিবাদের দার্শনিক আবেদনকেও তিনি যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করতেন। তিনি

ঈশোপনিষদের এই মন্ত্র অনুসরণ করে অহিংস সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই সমাজবাদের আদর্শ হল শ্রেণীহীন সমাজগঠন। এই প্রকার সমাজকে তিনি সর্বোদয় সমাজ নামে অভিহিত করেছেন।

গান্ধীভাবনায় সর্বোদয়ের অর্থ হল সার্বিক বিকাশ অর্থাৎ পূর্ণ আত্মবিকাশ বা সকল সদ্গুণের বিকাশ। তিনি দরিদ্র অবহেলিত মানুষদের ঈশ্বরের সন্তান বলে জ্ঞান করতেন এবং এদের সেবায় আত্মনিয়োগকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই সমাজে কেবলমাত্র সত্য অহিংসা ও সৎ উপায়ের ভিত্তিতেই সেই নৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব - যে নৈতিক পরিবেশে মানুষের মনে জাগ্রত হবে প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ। "The inherent spirit of Sarvodaya as 'the greatest good of all' as Gandhi asserts is an earnest human endeavour for spiritual regeneration and, as such, it ensures a definite pattern of socio-political emancipation of man" (Chakraborti, 1993, p-58). প্রকৃতপক্ষে, সত্য, অহিংসা ও সৎ উপায়- এই তিনটি নীতি ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুব সত্যস্বরূপ। সত্যকে তিনি অন্যান্য সকল নীতির মূলনীতি হিসাবে গণ্য করতেন, এবং অহিংসা হল তাঁর জীবনের প্রাণবায়ুস্বরূপ। এই ধরনের উন্নত পরিবেশে বসবাসকারী কোন মানুষই নীতিবিগর্হিত কাজ করবে না। সত্য, অহিংসা ও সততার মন্ত্রে দীক্ষিত সর্বোদয় সমাজের প্রতিটি মানুষের কাজ হবে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করা ও মহৎ চিন্তা করা। তারা অপরের স্বার্থে নিজের স্বার্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে। সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম করবেন। তাই সামাজিক কল্যাণের জন্য তিনি সত্য, অহিংসা, সৎ উপায়, মানুষে মানুষে প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতির মাধ্যমে লোকশক্তিকে জাগ্রত করাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার তিনি বর্ণাশ্রম এবং জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার না করেও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তিনি নিজধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে অবিচল থেকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সমন্বয়সাধন তথা ঐক্যস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। এইভাবে গান্ধীজী নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হতে উপদেশ দিয়েছেন। এমন মন্ত্রের দ্বারা সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বন্ধ হবে, ধনী নির্ধনকে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যকে, ভূম্যধিকারী ভূমিহীনদের আত্মার আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করবে। ব্যক্তিমন উন্নীত হলে সামগ্রিক সমাজ মনও উন্নীত হবে, এবং ক্রমশ সব রকম ভেদাভেদ জ্ঞান দূরীভূত হবে। অবশেষে এমন অহিংস জ্ঞানেই মানুষ সাম্যবাদে উন্নীত হবে। এরূপ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই হল সর্বোদয়ের আদর্শ। এরূপ সমাজব্যবস্থাকে গান্ধীজী স্বরাজ বলে অভিহিত করেছেন (ভট্টাচার্য, ২০১১, পৃ-৩১)।

উপসংহার:

এইভাবে গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও নৈতিক ভাবনাচিন্তার মূলভিত্তি হল সত্য ও অহিংসা। মানবসমাজে তাঁর এই অবদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মহাত্মা' নামে অভিহিত করেছেন। জহরলাল নেহেরু তাঁকে সক্রেটিস সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে 'জাতির জনক' বলে অভিহিত করেছেন এবং কার্ল হিথ তাঁকে 'man of the people amongst the people' নামে চিহ্নিত করেছেন। সহজ সরল জীবনযাপন করা, সত্যনিষ্ঠ, আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া, বিভিন্ন কলাকৌশল ও সহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে প্রয়োজন মানসিক

দৃঢ়তা, অনুশীলন অর্থাৎ সত্যের পরীক্ষা, দীর্ঘ নৈতিক প্রস্তুতি, সত্যাগ্রহ, অহিংসা এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব হল গান্ধীজীর জীবনাদর্শের মূলকথা। এইভাবেই সত্যদর্শনের প্রয়াস করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্র ছিল গবেষণাগার; এবং মানুষ ছিল তাঁর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। এক্ষেত্রে তিনি দুটি অস্ত্রের মাধ্যমে তাঁর জীবন সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দুটি অস্ত্র হল অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। তবে, তিনি সমকালীন পরিস্থিতির প্রয়োজনে এবং নিজের তাগিদেই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। কিন্তু কখনোই তিনি সেই সমস্ত মতামতকে চূড়ান্ত বলে দাবি করেন নি। ক্ষেত্রবিশেষে সেই মতামতের পরিবর্তন করেছেন এবং নিজস্ব মতামত পরিবর্তনশীলতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন; কারণ তাঁর কর্তৃত্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা ও আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তা ও নিয়মনীতির উপর তাঁর আনুগত্য তাঁকে নেতৃত্বের অনেক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন দৈহিক শক্তি কিংবা জাগতিক শক্তি নয়, সত্যের শক্তি হল প্রকৃত শক্তি। এই শক্তি গান্ধীজিকে শক্তিমান করে গড়ে তুলেছিল। আবার ধর্ম সম্পর্কে তিনি যে মনোভাব গ্রহণ করেন তাতে পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। সকল মানুষের কল্যাণসাধনকে তাঁর জীবনের অন্যতম আদর্শ বলে অভিহিত করেছেন। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তাঁর সমগ্র জীবিতকাল সময়ে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, "আজ থেকে এক হাজার বছর পরে মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভাববে এমন একজন মানুষ সত্যিই পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলেছিলেন" (সেনগুপ্ত, ২০০২, পৃ-০১)। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তায়, কথায়, দৈনন্দিন জীবনযাপনে, দার্শনিক ভাবনায়, সমাজচিন্তায়, রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ভাবনা সবকিছুতেই তিনি অহিংসা নীতি অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ পৃথিবীতে যতদিন ন্যায়নীতি, পরার্থপরতা, সর্বোপরি মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা বিশেষত অহিংস ভাবনার আবেদন থাকবে। তাই তাঁর জন্মদিন আজও সারাবিশ্বে 'বিশ্ব অহিংসা দিবস' (International Non-violence day) হিসেবে পালিত হয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

1. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, (সম্পাদিত), ২০২০, *বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শন চর্চা,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক
2. দাশগুপ্ত, পান্নালাল, ১৯৯৯, *গান্ধী গবেষণা,* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন
3. বন্দোপাধ্যায় সৈকত, ২০২৩, *বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন,* কলকাতা: নবোদয় পাবলিকেশান
4. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, ১৪১১, *বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা: সদেশ
5. ভট্টাচার্য, সুজিতকুমার, ২০১১, *মহাত্মা গান্ধী,* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক
6. মহাপাত্র, অনাদি ও বন্দোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন, ২০১৬, *ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন,* পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা: সুহৃদ পাবলিকেশান

7. মহাশ্বেতা দেবী, (অনুদিত), (১৯৯৪*), গান্ধী মানস* (সংকলন ও সম্পাদনা আর. কে প্রভু ও ইউ. আর. রাও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া), আহমেদাবাদ: নবজীবন পাবলিশিং হাউস
8. রায়, সুপ্রকাশ, ১৯৮৭, *গান্ধীবাদের স্বরূপ,* কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশান
9. সেনগুপ্ত, ইরা, ২০০২, *মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন,* প্রকাশক: এস সেনগুপ্ত, বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক জেড, ফ্ল্যাট-৪, কলকাতা
10. Bandopadhya, Jatantanuja., 1969, *Social and Political Thought of Gandhi*, New Delhi: Allied Publishers
11. Bose, N. K. 1960, *Selections from Gandhi,* Ahemadabad: Navajivan Mudralaya
12. Chakrabarti, Mohit, (1993), *Gandhian Spiritualism A Quest for the essence of excellence*, New Delhi: Concept publishing company
13. Iyer, R. N., 1973, *The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi*, Delhi: Orford University press
14. Padhy, K. S., 2011, *Indian Political Thought*, New Delhi: PHI Learing (P) limited
15. Varma, V. P., 1994, *The Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvovaya,* 5th edition, Patna: Bharati Bhavan
16. Parek, Bhikhu, 1997, *Gandhi: A very short introduction*, NewYork: Oxford University Press
17. Lal, B.K., 1973, *Contemporary Indian Philosophy*, 1st Indian edition, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers